দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 DEC 2008 পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

শিক্ষার্থীদের উদ্বেগজনক ড্রপআ

স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের ভেতর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে প্র
শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ে। নবম থেকে দশম শ্রেণীর মধ্যে ঝরে
হার প্রায় ৭৩ শতাংশ। আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই হার কমপ
শতাংশ। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে এসব তথ্য জানা
শিক্ষা বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণীতে য
হয় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী তাহলে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার সময়
থাকে মাত্র ২০ জন শিক্ষার্থী। অবশিষ্ট ৮০ জন শিক্ষার্থীই স্কুল
বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে যায়। এসব পরিসংখ্যান নাকি নেয়া হয়েছে
সূত্র থেকে। ক্লাস ওয়ান থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ড্রপআ
হার এবং সংখ্যা যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক এই বিষয়টি বিভিন্ন সময়
সংবাদপত্রসমূহে হাইলাইট করা হয়েছে। দৈনিক 'ইনকিলাব' এ
একাধিক সম্পাদকীয় এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ বছরের
দিকে অপর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে দেখা য
কক্সবাজার জেলায় প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া শি
হার ২৫ ভাগ। ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে এ জেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে
শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৮৮ হাজার ৩০২ জন। সেই হিসা
বছর ৭২ হাজারের অধিক কোমলমতি শিক্ষার্থী ঝরে গেছে।
একটি খবরে প্রকাশ, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বা ড্রপআ
সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি এখনও ৩ শতাংশ শিশু স্কুলেই য
সরকারী এক জরীপ অনুযায়ী ড্রপআউটের হার শতকরা ৪৮
দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৫ সালের চেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশী।
সালে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার যেখানে ছিল ৩৩ শতাংশ, বর্তম
বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৭ শতংশ।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে
সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো এই ড্রপআউট। শিক্ষার্থী, বিশে
ছাত্রীদের এই ড্রপআউট বন্ধ অথবা সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা
চেষ্টা অতীতে করা হলেও সেটি তেমন ফলবতী হয়নি। তাদে
পড়ার মূল কারণ হলো দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, বৈষম্য এবং
বিবাহ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার মতে, এই ড্রপআ
বড় কারণ হলো প্রাথমিক পর্যায়ের পর ছাত্রীদের নিরাপত্তা
এছাড়াও দারিদ্র্য এবং সচেতনতার অভাব তো রয়েছেই। ড্রপআ
হার যেভাবে বাড়ছে তার ফলে আশংকা করা হচ্ছে যে, নির্দিষ্ট
মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা নাও হতে পারে।
করা যেতে পারে যে, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা কর্মসূচীর
সময়সীমা ছিল ২০০৮ সাল। কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রগতি অত্যং
হওয়ায় ২০০৯ সাল পর্যন্ত ঐ সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প
জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)
২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে
পিইডিপি-২ অনুযায়ী ২০০৯ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে
শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। এ লক্ষ্যকে সামনে
সরকার ১০টি দাতাগোষ্ঠী ও দেশের সঙ্গে মিলে পিইডিপি-২ বা
করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৮ হাজার সরকারী ও বেসরকারী
প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক র
বর্তমানে দেশে দেড় কোটিরও বেশী স্কুল গমনোপযোগী শিশু
বিশ্ব খাদ্য সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্কুল গমনো
৩৫ লাখ শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। ঝরে পড়াদের বেশিরভাগই শহরে
জনগোষ্ঠী, দেশের অতিদরিদ্র, হাওর-চরাঞ্চল, আদিবাসী ও
শ্রেণীর শিশু। তাছাড়া কার্যকর শিক্ষিতের হারও হতাশাজনক।

এক সময় বলা হতো যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সময়ের আবর্ত
যাচ্ছে যে, জাতির মেরুদণ্ড হওয়া ছাড়াও একটি শিক্ষিত জ
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান স্তম্ভ। যুগ বদলে গেছে। এখন রাজ
স্বাধীনতাকে তখনই অর্থবহ মনে করা হয় যখন সাধারণ
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সেক্ষেত্রে মানসম্মত সার্বজনীন
শিক্ষার বিস্তার ছাড়া সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা
শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই কারণে সরকারের
দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। সেই সাথে আরো
ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর কর্মসূচী। অবিলম্বে ছাত্রছাত্রী নি
প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ব্যাপক ড্রপআউট প্রতিরোধ ক
পারলে কাঙ্ক্ষিত ৮ শতাংশ জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব নয়। কিভ
ড্রপআউট প্রতিরোধ করা যায় সে ব্যাপারে সরকার জনগণের বিশে
শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতামত আহ্বান করতে পারেন।
মতামত পর্যালোচনার পর যতটুকু ঐকমত্যে উপনীত হওয়া যায়,